বাঙ্গালীর সংস্কৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর সংস্কৃতি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
লাবনী প্রিন্টার্স
৪৪/জি আজিমপুর রোড আমতলা ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Bangalir Sangskriti (A Collection of Essays on Bengali Culture) by Dr Suniti Kumar Chatterji Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: August 2019
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94239-0-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচি

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ৯
বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত : জাতি গঠনে ৩৪
গৌড়বঙ্গ ৩৮
প্রাচীন বঙ্গের পুষ্করণা-জনপদ ৪৪
পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা ৪৮
শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালী জীবনের ছবি ৫৬
রঙিন চিত্রসূচি ৬৪

বাঙ্গালীর সংস্কৃতি

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করিতে চাহি।

'বাঙ্গালী জাতি' বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা-ই 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি'। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে-সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা-ই 'বাঙ্গালা সাহিত্য'।

এখন পাঁচ কোটির অধিক লোকে বাঙ্গালা ভাষা বলে।* সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালী জাতি নগণ্য নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের সংখ্যা অধিক। আমি এই বিষয়ে আমার দেশবাসিগণের ও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। অবশ্য, কেবল অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু নাই; কিন্তু সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীয় বস্তু নহে; এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবও অন্য পাঁচটি ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটি প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

এই-যে কয়েক কোটি বাঙ্গালা-ভাষী যাহারা সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাস করিতেছে এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালীদের দেশে গিয়াও যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের

---

* উপস্থিত কালে (১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) সাড়ে সাত কোটির উপর লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। [বর্তমানে, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে, বাংলাভাষীর সংখ্যা চোদ্দো কোটির মতো]

মধ্যে একটা ভাষা-গত স্বাজাত্য অনুভব করে। বিদেশে অন্য ভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, এই স্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের কাছে বিশেষ পরিস্ফুট হয়। আজ-কাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন,—সম্পূর্ণাঙ্গ স্বাজাত্য-বোধ আসা এক রকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জন-সমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে একরাজ্য-পাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষা-গত বৈষম্য থাকিলে, ওতপ্রোত-ভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনের সঙ্ঘ-বদ্ধ বিবিধ ভাষা-ভাষী একাধিক জন-সমষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটি ভাষাকে রাখিতে হয়,—অন্যগুলিকে হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নির্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিয়াই তবে গ্রেট-ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঘটিয়াছে—স্কট্‌লান্ডের গেলিক ও ওয়েলস্-এর ওয়েলম্-ভাষাকে বিলোপের পথে আগাইয়া দিয়া ইংরেজির প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকে নির্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রেত ভাষাকে ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প করিয়া, ফরাসি ভাষার অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র-গত একতা স্থাপিত হইয়াছে। বহুভাষাময় রুষ সাম্রাজ্যেও এই প্রকারে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়,—এক সময়ে রাজভাষা রুষের চাপে পোলীয় ভাষা, লিথুআনীয়, লেট, এস্তোনীয়, ফিন্, আর্মানি প্রভৃতি ভাষার প্রাণসংশয় হইয়াছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত সাম্রাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারা মাথা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, নিজ-নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া, কেহ-কেহ হয়তো এগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দীর অবস্থান কামনা করিবেন; কিন্তু কার্য্যত তাহার সাধন করা অসম্ভব—এক কোটি, দুই কোটি, পাঁচ কোটি লোকের ভাষাকে এভাবে মারা যায় না। বিশেষত প্রান্তিক জনগণ যেখানে পৃথক প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এরূপ কল্পনা করাও যায় না।

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণ-ই হইতেছে—প্রান্তিক ভাষা। এইজন্য বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া, সম্পূর্ণ রূপে একীভূত

রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ হইয়াছে। রুষ সাম্রাজ্যের তাবৎ ভাষাকে এখন নিজ-নিজ গৃহে স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষেও দাঁড়াইতেছে তাহা-ই। The United States of India, অর্থাৎ 'ভারবর্ষের সংযুক্ত রাষ্ট্র'—ইহা হইতেছে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিগার, হিন্দুস্থান বা সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানী মধ্য-প্রদেশ, মহাকোশল, মারাঠী মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিল-নাড়ুর, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষাগত প্রদেশে বিভাগ করিয়াছেন। এক-একটি প্রদেশে এক-একটি ভাষা অবলম্বন করিয়া এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি: সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে 'রাষ্ট্র-ভাষা' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য ও অনপনেয়-সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে, ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশির ভাগ-ই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে সেই-সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না—সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত-প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার। অন্য দেশের সমক্ষে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু, ঈষৎ পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পর্যায়েই পড়ে। একটি বাহ্য ও সহজ ব্যাপারেই এইটি দেখা যায়। আমাদের চেহারায় একটা সাধারণ অনন্যদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে; অন্য দেশের মানুষের তুলনায়, আমাদের দেশের যে-কোনও প্রদেশের মানুষের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যায়। গায়ের গৌর-বর্ণে, কিংবা শ্যাম-বর্ণে, মুখে-চোখের সমাবেশে, চাহনিতে, চলনে, বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবর্ষেরই পরিচায়ক। অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙ্গের সাঁওতাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জনসঙ্ঘের মধ্যে কতকগুলি extreme type অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে-কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী

জনকতককে ধরিয়া, তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ি, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানি কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছন দূর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ-জিনিস দেখিয়াছি, আমার মতো অনেকেও দেখিয়াছেন; এ-দেশেও লোকে অহরহ দেখিতেছি। ইংরেজি পোশাক-পরা সাধারণ ভারতীয় মানুষকে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে রেলে বা অন্যত্র দেখি, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা কঠিন হয়—লোকটি কোন প্রদেশের; লোকটি বাঙ্গালী হইতে পারে, না-ও হইতে পারে, এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি—বাঙ্গালী ভারতীয়-ই বটে। বাঙ্গালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকি চার আনায় সে বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকারমাত্র,—বাকিটুকু খাঁটি বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইসলামের প্রভাব আছে-সে-প্রভাব কতটা আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করিবেন; তবে তাহা খুব বেশি নহে; এ-বিষয় লইয়া পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এতটা কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির কথা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এই-সব জিনিসের ভারতীয় আধার বা পটভূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি; ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপর অনুচিত ও অন্যায়ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে—ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের এখনকার এই দাপট, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই হানিকর হইবে। কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন—"সামাল সামাল, এটা আপদের সময়; কমঠ-ব্রত বা কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালীয়ানার খোলার ভিতরে হাত পা গুটাইয়া ব'সো, বাঁচিয়া যাইবে; 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া চেঁচাইও না। বলো 'বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গ-মাতার জয়'; Sinn Fein অথাৎ We Ourselves এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাঁচ; এবং সম্ভব হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়াই আরব তথা উর্দুওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের আধি-মানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদেরও বাঁচাও,—তাহারা খাঁটি বাঙ্গালী থাকিলে, বাঙ্গালী হিন্দু, তুমিও বাঁচিয়া যাইবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার। Confusion of issues অর্থাৎ বিষয়-বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত প্রদেশ, বৃহত্তর পাঞ্জাব, বৃহত্তর ভাটিয়া ভূমি, বৃহত্তর বিহার, বৃহত্তর অন্ধ্র, বৃহত্তর কেরল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে সে-সকলের অর্থনৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা' করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে-আধ্যাত্মিক যোগ আছে সেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া, অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব,—কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নূতন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনার কালে আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না। বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিব-ই,—এই অপূর্ব নারী চরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের সৃষ্টি; কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া, বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন;—আদি আর্য্য-ভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা-ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে অর্থাৎ আদি আর্য্য-যুগের বা সংস্কৃত-যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা-সাবিত্রীকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গালার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের স্থানে নবাবিস্কৃত বাঙ্গালা-পল্লী-গাথাবলীর নায়িকা মলুয়া মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকার পোশাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্য্য-যুগে মেয়েরা যে 'ঘাঘরা' পরিত না, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরনের সাড়ি পরাইয়া দিয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া

লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব না; কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটি শব্দ দ্বারা এই চেষ্টায় বর্ণনা করা যায়—সে-শব্দটা হইতেছে 'আদিখ্যেতা'—অর্থাৎ, বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য; এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্যান্য মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটি দেখিতে পাই-আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কী কী বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তি-সহ হউক বা না হউক) বলিয়া, sensationalism বা চমকপ্রদতার সৃষ্টি করা। বঙ্গদেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গালা-ভাষায় সাহিত্যই গড়িয়া উঠিত না—ইহার এইরূপ sensational এবং যুক্তিহীন কথা।

ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তা-বোধও আসে না। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তি কথা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা এখন হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা সৃজ্যমান, তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হিমাচল-কন্যা গঙ্গার দান; পলিমাটিতেই বাঙ্গালার উদ্ভব। বাঙ্গালা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তর-ভারতে উদ্ভূত আর্য্যভাষা, প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন। গঙ্গার মতো আর্য্য-ভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্য্য ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য্য—ভাষা প্রাকৃত এই বাঙ্গালায় আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল; প্রাকৃতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কৃতও আসিল।

মৌর্য্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে আর্য্য-ভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গঙ্গা-উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়া অনুমান হয়। মৌর্য্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত-রাজবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত-খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত, এই আট শত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় বাঙ্গালা দেশের আর্য্যীয়করণ চলিতেছিল; এই আট শ' বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার অস্ট্রিক ও দাবিড়-ভাষী জনগণ নিজ অনার্য্য ভাষাসমূহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে আর্য্য-ভাষা—অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত-গ্রহণ করে; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর-ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ-বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।

এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-সভ্যতাই যেন এই নব-সৃষ্ট আর্য্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম-নীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী

মুখ্যতঃ অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্যরক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্য-মিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্য-ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটি, যাহাকে ইংরেজিতে discipline বলে, তাহা পাইল: বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্য মনের—ব্রাহ্মণ্যের—এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউ-এন্ থসাঙ্ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় যে, তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা আর্য্য-ভাষী হইয়া গিয়াছিল। তারপরে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বরেন্দ্র-ভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নবসৃষ্ট বাঙ্গালী জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশ লাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহার পরে তাঁহারা দেশ-ভাষার দিকে সৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী প্রাকৃত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা-ভাষা, একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়া; এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্য-ভাগ-রচনা—হইতে লাগিল।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা-ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসের কাঠামো বা মূল-কথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। আর্য্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে যখন বাঙ্গালী-সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেন বাঙ্গালীর নিজস্ব অনার্য্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে-ছাঁচে বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য—রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য সব-ই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্ব-জয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন,—ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, শিল্প ও সাহিত্য। যে-ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে, অর্থনৈতিক ও মানসিক নানা বিপর্য্যয় এবং বিপ্লবের আগমনে, আমরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আমাদের সমাজকে ভাঙিয়া-চুরিয়া আবার এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে যাইতেছি।

পাল-যুগে নূতন সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতির মনের সুর, তাহার আর্য্য-ভাষার তারকে অবলম্বনে করিয়া, উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যেভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মোটের উপর সে সুরটি এখনও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই একই সুরে নানান ঝংকার শুনা গিয়াছে; কখনও বৌদ্ধ, কখনও ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনও বৈদিক (বৈদিকের ঝংকার বাঙ্গালা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণভাবে শুনা

গিয়াছে), কখনও শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব, এবং কখনও সুমলমান সূফী। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রও এই ঝংকারের অন্যতম।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির, ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল। তারপর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিয়া গেল। মনে হইল, বুঝি সে-ঝড়ের মুখে বঙ্গ-বাণীর বাঁধা তার ছিঁড়িয়া যাইবে,—প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তার সৌধ ভাঙিয়া পড়িবে। তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই—তখনকার দিনের বাঙ্গালীর সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালী নিজেকে এই অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত বা প্রদেশ-বাসী বলিয়া মনে করিত। যে-ঝড় কাবুল হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বহিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির মধ্যেই তাহার জীবনী শক্তি অটুট রহিল। মুষ্টিমেয় তুর্কী-বিজেতা ও তাহাদের পারসিক, পাঠান ও পাঞ্জাবী-মুসলমান অনুচর যাহারা বাঙ্গালায় রহিয়া গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুর্কি ও অন্য বিদেশী বিজেতৃগণ দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই। উত্তর-ভারতের সঙ্গে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বঙ্গালার যে-ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সে-যোগ তুর্কী-বিজয়ের পরে যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত; তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালী-ই হইত।

প্রথম সংঘাতের পরে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটি সংস্কৃতি বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হইল; মুসলমান সূফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তর-ভারত হইতে এবং ক্বচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের অনেককে বলপূর্বক মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতির ফলে, মুখ্যত ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তি। অর্থাৎ কোরান-অনুসায়ী ইসলাম নহে। শরিয়তি মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সূফী মত-ই বেশি প্রসার লাভ করে। সূফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সূফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে